৯
খ্রীষ্টান জগৎ ঃ সম্প্রসারণ, চ্যালেঞ্জ ও আত্মরক্ষা

একাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত

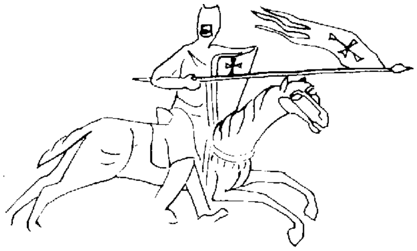

দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধে একজন যোদ্ধা

খ্রীষ্টান জগৎ ছিল একটি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বাস্তবতা, এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যার মূল ভিত্তি ছিল খ্রীষ্টধর্ম। তাই তাকে বিশ্বাসের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হত, কারণ এই শত্রুরা এর সামগ্রিক কাঠামোর পক্ষে হুমকিস্বরূপ ছিল। এর বাইরে ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আর ভিতরে ছিল ভ্রান্ত মতবাদীরা। এ কারণেই খ্রীষ্টান জগৎ ক্রুশেড বা ধর্মযুদ্ধের আকারে নিজেকে অস্ত্র-সজ্জিত করতে আরম্ভ করে ও ধর্মীয় দণ্ড ব্যবস্থার আকারে দমনমূলক বিচার ব্যবস্থা সুসংগঠিত করতে শুরু করে।

কিন্তু এটা সমস্যার কোন পূর্ণ সমাধান ছিল না। বলপ্রয়োগ ক'রে সুসমাচার প্রচার করা যায় না। ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে একটা সন্দেহের ফলশ্রুতিতে ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে একটা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। প্রাতিষ্ঠানিক মণ্ডলী তখন যেরূপ আচরণ করত, তার প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন ব্রতজীবনের উৎপত্তি হয়।

॥ ১ ॥ ধর্মযুদ্ধ ও ধর্মপ্রচার

১। সশস্ত্র খ্রীষ্টান সমাজ

এই সময় খ্রীষ্টান সমাজের একটি অভিন্ন শত্রু ছিল ইসলাম ধর্ম, কেননা ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তখন খ্রীষ্ট যে যে স্থানে বসবাস করতেন সেই স্থানগুলো অন্যায়ভাবে দখল ক'রে রেখেছিল এবং প্রাচ্যের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ভীতিপ্রদর্শন ক'রে আসছিল। তাই তাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত হতে ও অস্ত্রধারণ করতে গিয়ে খ্রীষ্টান জগৎ তার নিজস্ব পরিচিতি ও ঐক্যের ব্যাপারে সচেতনতার পরিচয় দেয়। এ কারণেই মধ্যযুগের যে কোন বৃত্তান্তে একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যরূপে ধর্মযুদ্ধের কথা উঠে আসে।

জেরুসালেমে তীর্থযাত্রা

বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধের উৎপত্তি হয় জেরুসালেম নগরীতে তীর্থযাত্রা থেকে। এই তীর্থযাত্রা ছিল প্রধানতঃ আত্মশুদ্ধির ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্যালেষ্টাইনে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তীর্থযাত্রীরা খ্রীষ্টের পার্থিব জীবনের ও তাঁর দুঃখ-যাতনার অংশীদার হতে চেষ্টা করে। এমন কি যীশু যেখানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তারাও সেখানে মরতে ইচ্ছা করে যাতে ক'রে তারা শেষ বিচারের দিনে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত হতে পারে। তীর্থযাত্রাকালে তীর্থযাত্রীরা যে সব বিপদ-আপদের সম্মুখীন হত তা থেকে তাদের মনে সশস্ত্র তীর্থযাত্রার চিন্তার উদয় হয়। উপরন্তু, স্পেনে তখন এমনও দাবি করা হত যে, যারা অবিশ্বাসীদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে মারা যাবে, তারা নিশ্চিতভাবে পরিত্রাণ লাভ করবে।

একাদশ শতাব্দীতে এক নতুন মুসলিম শক্তিরূপে তুর্কীদের অভ্যুদয় ঘটে। মধ্য এশিয়ার স্তেপ অঞ্চল (অর্থাৎ বিশুষ্ক তৃণপ্রধান বৃক্ষহীন প্রান্তর) থেকে আগত তুর্কীরা প্রাচ্যের ক্ষমতার ভারসাম্যের পক্ষে এবং বিশেষ ক'রে ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দে নানজিকের্ট-এর যুদ্ধে বাইজান্টাইনের পরাজয়ের পর কনস্টান্টিনোপলের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠে। এতে মানুষ মনে করতে থাকে এই বুঝি তীর্থযাত্রায় যাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠল। গ্রীক সম্রাট আবার সাহায্যের আবেদন জানান।

ধর্মযুদ্ধের ডাক

[১১৬] ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লের্মন্ট মহাসভায় পোপ দ্বিতীয় উর্বান প্রাচ্যের খ্রীষ্টানদের সাহায্যার্থে পাশ্চাত্যের নাইটদের এগিয়ে

[১১৬] ক্লের্মণ্ট-এর মহাসভা (১০৯৫ খ্রীঃঅঃ)

"... বহু খুঁটিনাটিসহ পোপ দ্বিতীয় উর্বান প্রাচ্যের খ্রীষ্টান সমাজের উচ্ছিন্নতা সম্পর্কে একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ দেন এবং সারাসিনরা খ্রীষ্টানদেরকে যে নৃশংস উৎপীড়ন ও কষ্ট-যন্ত্রণায় জর্জরিত করছিল, তার বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তাঁর ধর্মীয় আবেগমিশ্রিত ভাষণে এই সুবক্তা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সমানে ব'লে যাচ্ছিলেন ঈশ্বর-পুত্র তাঁর অতি পবিত্র শিষ্যদের সঙ্গে জেরুসালেম ও পুণ্যভূমির যে যে স্থানে বসবাস করতেন, সেই স্থানগুলো কিভাবে পদদলিত হচ্ছিল। তাঁর কথা শুনে শ্রোতাদের অনেকে তাদের অশ্রু সংবরণ করতে পারছিল না; তারা তাঁর গভীর আবেগ ও তাদের ধর্মভাইদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির সহভাগী হন। একজন সত্যের বীজ বপনকারীর বাকপটুতা নিয়ে তিনি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে এক দীর্ঘ ও অত্যন্ত প্ররোচনামূলক ভাষণ দান করেন। তিনি পাশ্চাত্যের বড় বড় নেতা ও তাদের সশস্ত্র সহচরদের আহ্বান করেন যাতে তারা তাদের সমস্ত লেনদেনে অতি যত্নে শান্তি রক্ষা ক'রে চলেন এবং তাদের ডান স্কন্ধে পবিত্র ক্রুশের চিহ্ন নিয়ে তাদের সামরিক অভিযানে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়ে সেরা ও খ্যাতিমান সৈনিকের স্বাক্ষর রাখেন।

জেরুসালেমে যাওয়ার জন্য বা যারা সেখানে যাচ্ছে, তাদের সাহায্য করার জন্য ধনী-গরীব, মহিলা, সন্ন্যাসী ও যাজকদের মধ্যে, গ্রামবাসী ও শহরবাসীদের মধ্যে একটি বিপুল সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়। স্বামীরা বাড়ীতে তাদের স্ত্রীদের রেখে যেতে মনস্থির করেন; কিন্তু স্ত্রীরা তাদের চোখের জল ফেলে তাদের স্বামীদের অনুগামী হওয়ার এবং তাদের ছেলেমেয়েদের ও তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ ছেড়ে তীর্থযাত্রায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যে সমস্ত জমিজমার দাম আগে অনেক বেশী ছিল, তা এখন সস্তায় বিক্রি হয় এবং সেই অর্থ দিয়ে অস্ত্র ক্রয় করা হয় যাতে আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর ধর্মতঃ সমুচিত প্রতিশোধ নেয়া যায়। চোর, জলদস্যু ও অন্যান্য অপরাধীরা তাদের অধর্মাচারের গভীরতর অবস্থা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে; তারা ঐশ আত্মার স্পর্শে তাদের যত দুষ্কর্মের কথা অকপটে স্বীকার করে, এবং পূর্বের সমস্ত অধর্মাচার ত্যাগ ক'রে তাদের সমস্ত পাপের জন্য ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

এদিকে, একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিরূপে পোপ মহোদয় অস্ত্রধারণ করতে সক্ষম সকলকে ঈশ্বরের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ডাক দেন। আর তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অধিকারের গুণে সকল অনুতাপীর সমস্ত পাপ মুক্ত করেন যে মুহূর্তে তারা খ্রীষ্টের ক্রুশ কাঁধে তুলে নেয় তখন থেকে। সেইসঙ্গে তিনি উপবাস বা দৈহিক প্রায়শ্চিত্ত হতে উদ্ভূত যত অসুবিধা থেকেও তাদের অব্যাহতি দেন। ..."

অর্ডারিকাস ভিটালিস, একজন নর্মান সন্ন্যাসী
মণ্ডলীর ইতিহাস, (১১৩৫ খ্রীঃঅঃ)

আসতে ও পুণ্যভূমির পবিত্র স্থানগুলো জয় করে নিতে আহ্বান জানান। এভাবে তিনি খ্রীষ্টান নেতা ও সাম্রাজ্যের সেসব দেশগুলোর উত্তরাধিকারীরূপে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়, তিনি তাদেরকে পুরস্কার হিসেবে তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্ণমুক্তি দেশগুলোর দায়িত্ব প্রদান করেন। একই সময় দরিদ্র নাইটদের চলে যাওয়াতে খ্রীষ্টান অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহের ঝুঁকি অনেকটা হ্রাস পায়। তারা অন্যত্র যুদ্ধে যায় এবং সেখানে তারা জায়গীর লাভ করে যা নাকি তারা পাশ্চাত্যে লাভ করতে সক্ষম হয়নি। এ যাবৎ খ্রীষ্টমণ্ডলী রক্তপাতের আশঙ্কাবোধ করে আসছিল। কিন্তু এরপর থেকে মণ্ডলী নিজেই ধর্মযুদ্ধের আয়োজন করে যার নাম দেয়া হয় 'ক্রুসেড' (Crusade)। যারা তাদের যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে পবিত্র ক্রুশ ধারণ করত তাদেরকে পোপ মহোদয় পূর্ণ দণ্ডমোচন প্রদান করতেন ঃ তাদের নিজ পাপের মার্জনার জন্য অপরিহার্য সকল প্রায়শ্চিত্ত করা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি প্রদান করা হত।

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযোদ্ধাদের কনস্টান্টিনোপল অধিগ্রহণ

রক্তের নদী ও কাঁচা ধর্মানুরাগ

মরুবাসী সন্ন্যাসী পিতর দ্বারা পরিচালিত হতভাগ্য লোকদের মাঝে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল ঃ পুরো যাত্রাপথে তাদের বহুসংখ্যক লোক নিহত হয়েছিল। ভয়ঙ্কর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতি এবং অকপট ধর্মানুরাগ প্রকাশের প্রতি সঙ্গতি রাখতে নাইটগণ তাদের অনুসরণ করেন এবং ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জেরুসালেম অবরোধ করেন। [১১৭]
জেরুসালেম রাজ্যসহ কয়েকটি ল্যাটিন সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যগুলোর রক্ষার্থে ধর্মীয় সামরিক

[১১৭] প্রথম ধর্মযুদ্ধের সময় জেরুসালেম অবরোধ (১৫ই জুলাই, ১০৯৯ খ্রীঃঅঃ)

" ... শুক্রবার দিন (১৫ই জুলাই) খুব সকালে আমরা একটি সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করি শহরটির উপর, কিন্তু আমরা এর কোন ক্ষতিই করতে পারলাম না। তাই আমরা হতভম্ব ও অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। এমন সময় যখন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য ক্রুশের যন্ত্রণাভোগ করতে সম্মত হলেন, তখন অবরোধের জন্য ব্যবহৃত কামানের দায়িত্বে নিয়োজিত আমাদের নাইটগণ তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলেন – এদের মধ্যে অন্যান্য যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডিউক গডফ্রে ও তাঁর ভাই কাউন্ট ইউস্টেস। সেই সময় লিয়েটোড নামে আমাদের একজন নাইট শহরের প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠে পড়েন। তিনি প্রাচীরের উপর উঠা মাত্রই শহর রক্ষায় নিয়োজিত সকলে রক্ষাপ্রাচীর থেকে নেমে পালিয়ে যায়। আমাদের লোকেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে; শত্রুদের তাড়া ক'রে তাদের হত্যা করে, সলোমনের মন্দির পর্যন্ত তাদেরকে তরবারির আঘাতে ঘায়েল করে – সেখানে এমন ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় যে, আমাদের লোকেরা সেখান দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাদের পা গোড়ালি পর্যন্ত রক্তে ডুবে যায়।

বিধর্মীদের রক্ষাব্যূহ ভেদ ক'রে আমাদের সৈন্যরা মন্দিরে এক বিশাল সংখ্যক নরনারীকে গ্রেফতার করে, এবং তাদের কাছে যা ভাল মনে হয়েছে সে মোতাবেক তারা তাদের হয় হত্যা করেছে নতুবা ছেড়ে দিয়েছে। বিধর্মীদের নারী-পুরুষের একটি বিশাল দলকে বিয়ার্নের ট্যানক্রেড ও গাস্টন নিরাপদ ব্যবস্থা হিসেবে তাঁদের পতাকা দিয়ে দেন। নারী-পুরুষরা সলোমনের মন্দিরের শীর্ষে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে। ধর্মযোদ্ধারা দেরী না ক'রে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ও সোনা-রূপা, ঘোড়া-গাধা যে যা পেয়েছে হস্তগত করে এবং ধন-সম্পদের স্ফীত যত বাড়ী-ঘর লুণ্ঠন করার পর আনন্দ মনে ও চোখে আনন্দাশ্রু নিয়ে আমাদের লোকেরা প্রভু যীশুর পুণ্য সমাধিতে যায় তাদের ভক্তি-অর্ঘ নিবেদন করতে। সেখানে তারা তাঁর কাছে তাদের ঋণ শোধ করে (তাদের ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা)। পরদিন সকালে আমাদের লোকেরা মন্দিরের ছাদে আরোহণ ক'রে সারাদিন যত নর-নারীকে আক্রমণ করে এবং তরবারি দ্বারা তাদের শিরচ্ছেদ করে। কেউ কেউ মন্দির থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করে। এ দেখে ট্যানক্রেড ক্ষুব্ধ হন ...।"

ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন অজ্ঞাতনামা নাইটের লেখা প্রথম ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস থেকে।

[১১৮] পিকিং-এর প্রথম মহাধর্মপাল

খানবালিক (পিকিং) থেকে প্রেরিত পত্র, ৮ই জানুয়ারী ১৩০৫ সাল

"১২৯১ খ্রীষ্টাব্দে আমি, ফ্রান্সিসকান ফ্রায়ারস্ মাইনর সংঘের মন্তে কর্ভিনোর ব্রাদার জন পারস্যের টাউরিস নগরী ত্যাগ ক'রে ভারতবর্ষে প্রবেশ করি। আমি এই দেশটিতে সাধু টমাসের গির্জায় তের মাস অবস্থান করি ও প্রায় একশ' লোককে দীক্ষাস্নাত করি ... সেখান থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করে আমি তার্তারদের সম্রাটের রাজ্য কাথে এসে পৌছি - তখন তার্তারদের সম্রাটকে বলা হত মহাপ্রাণ খান। উক্ত সম্রাটকে পোপ মহোদয়ের পত্রাবলী প্রদানের সময় আমি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিধানের কথা প্রচার করি। সম্রাটও তখন মূর্তিপূজায় বদ্ধমূল ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টানদের প্রতি তাঁর সুমতি ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে বারো বছর ধরে আছি ...

এই সুদূর তীর্থযাত্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি এগারো বছর ধরে কোন পাপস্বীকার করতে পারিনি যতক্ষণ না কোলন প্রদেশ থেকে ব্রাদার আরনল্ড নামে একজন জার্মান এসে পৌছান। তিনি এখানে দু'বছর ধরে আছেন।

খানবালিক শহরে আমি একটি গীর্জা নির্মাণ করেছি। গির্জাটি শেষ করতে ছয় বছর লেগেছে। গীর্জাঘরের পাশে তিনটি ঘণ্টাসহ একটি পৃথক ঘণ্টাঘরও তৈরী করেছি। আমার মনে হয় আমি এই গীর্জায় প্রায় ছয় হাজার মানুষকে দীক্ষাস্নাত করেছি। আমি আগেই যে কুৎসা বা কলঙ্ক রটনার কথা বলেছি, তা যদি না হত তা হলে ত্রিশ হাজারের অধিক মানুষকে দীক্ষাস্নাত করতে পারতাম। আমি প্রায়ই দীক্ষাস্নান প্রদানে ব্যস্ত থাকি। আমি একে একে সাত বছরের নীচে ও বারো বছরের চল্লিশজন পৌত্তলিক ছেলেমেয়েও ক্রয় করেছি। তখনও তারা কোন ধর্মের কথা জানত না ঃ আমি তাদের দীক্ষাস্নাত করেছি এবং ল্যাটিন ভাষা ও আমাদের ধর্মোপসনা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছি।

আমারই মাধ্যমে এই অঞ্চলেরই একজন রাজা নেস্তারিয়াসপন্থী খ্রীষ্টান সত্যধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের প্রেষ্টার জন বলে খ্যাত মহান রাজার বংশের মানুষ। তিনি নিম্ন পর্যায়ের যাজকীয় পদসমূহ লাভ করেছেন ও ধর্মীয় পরিচ্ছদ পেয়ে আমাকে খ্রীষ্টযাগে সহায়তা করেন। নেস্তরিয়াসপন্থীরা তাঁকে স্বধর্মত্যাগের অভিযোগে অভিযুক্ত করে ঃ তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর লোকদের অধিকাংশকেই কাথলিক ধর্মে নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর রাজসুলভ অতুলনীয় দানশীলতার উপযুক্ত একটি সুন্দর গির্জা নির্মাণ করেছেন।

ভাইয়েরা আমার, যাদের কাছে আমার এই পত্র পৌছবে, আপনাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ – আমার চিঠির বিষয়বস্তু যাতে পোপ মহোদয়, কার্ডিনাল ও রোমীয় রাজদরবারে আমাদের সংঘের প্রতিনিধির গোচরীভূত হয়। আমাদের মিনিষ্টার-জেনারেলের কাছে আমি একটি ধুয়োর বই ও সাধু-সাধ্বীদের একটি জীবনীমূলক বই, একটি ধ্যান-গীতি ও আমাদের জন্য নমুনাস্বরূপ একটি সামসঙ্গীত বই ভিক্ষা চাই, কেননা এখানে আমার কাছে শুধুমাত্র একটি বহনযোগ্য প্রাহরিক প্রার্থনার ও খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠানের বই রয়েছে। আমার হাতে একটি নমুনা-পুস্তক থাকলে ছেলেমেয়েরা তা থেকে নকল ক'রে নেবে।

বর্তমানে আমি একটি নতুন গীর্জা নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছি যাতে ছেলেমেয়েদেরকে আলাদা আলাদা স্থানে ভাগ ক'রে দেয়া যায়। আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি এবং আমার মাথার চুল বেশ পেকেও গেছে যতটা না বয়সের ভারে – আমার বয়স সবেমাত্র আটান্ন বছর – তার চেয়ে বেশী ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায়। আমি বেশ ভাল তার্তার ভাষা ও লিপি, অর্থাৎ মোঙ্গলদের দ্বারা রেওয়াজ-মাফিক ব্যবহৃত ভাষা শিখেছি। আমি নূতন নিয়মের পুরোটা ও সামসঙ্গীত এই ভাষায় অনুবাদ করেছি। আমি চমৎকার লিপিকলার সাহায্যে এর প্রতিলিপি করিয়েছি এবং খ্রীষ্টের বিধানের সাক্ষ্যস্বরূপ তা প্রকাশ্যে দেখাই, পাঠ করি, প্রচার করি ও সকলকে জানাই।

রাজা জর্জের সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম, তিনি বেঁচে থাকলে, ল্যাটিন ভাষায় সম্পূর্ণ প্রাহরিক প্রার্থনা-পুস্তকটি অনুবাদ করার জন্য যাতে তাঁর অঙ্গরাজ্যের সব অঞ্চলে তা গীত হতে পারে। তাঁর জীবদ্দশায় ল্যাটিন উপাসনানুষ্ঠান – খ্রীষ্টযাগের যজ্ঞ-নিবেদন ও ধন্যবাদিকা-স্তুতির কথাসহ – তাঁর দেশের ভাষায় ও ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী তাঁর গীর্জায় অনুষ্ঠিত হত ...।"

পাঠাংশটি de Ghellink-Fr Revue d' Histoire des Missions, ১লা ডিসেম্বর ১৯২৮ থেকে উদ্ধৃত।

চিঠিটি ইউরোপে এসে পৌঁছেছিল। পোপ পঞ্চম ক্লেমেন্ট কয়েকজন ধর্মপালকে দূর প্রাচ্যে প্রেরণ করেছিলেন। যারা খানবালিকে এসে পৌঁছেছিলেন, তারা মন্তে কর্ভিনোর জনকে ধর্মপাল পদে অভিষিক্ত করেন আর এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন পিকিং-এর প্রথম মহাধর্মপাল। দক্ষিণ চীনের জায়টনে একজন ধর্মপাল অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তবে, নতুন প্রচারকর্মীদের অভাবে চীনে বাণী প্রচার ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে, এবং মোঙ্গলদের জায়গায় একটি নতুন চীন রাজবংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়।

সংস্থা (যেমন - নাইটস্ টেম্পলার, নাইটস্ হস্পিটেলার ইত্যাদি) সংগঠিত করা সত্ত্বেও রাজ্যগুলো একে একে বিলুপ্ত হয়। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের সুলতান সালাদীন জেরুসালেমকে পুনরায় দখল করেন। ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দের পর প্যালেষ্টাইনে ক্রুসেডের জন্য আর সৈন্য ছিল না।

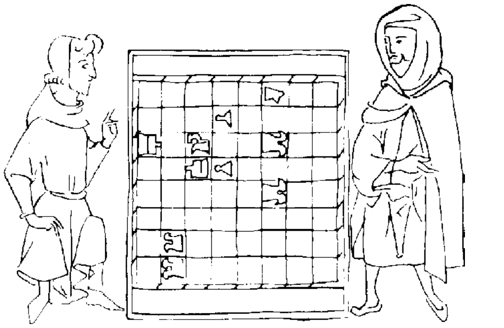

একজন খ্রীষ্টান বীর যোদ্ধা ও একজন মুসলমানের দাবা খেলা। (ত্রয়োদশ শতাব্দী)

অপর্যাপ্ত ফল লাভ

ধর্মযুদ্ধসমূহ খ্রীষ্টান জগতকে ঐক্যবদ্ধ করতে ও পোপতন্ত্রের ক্ষমতা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করতে সহায়তা করেছে। কিন্তু অন্যদিকে তা প্রাচ্যের খ্রীষ্টান ও পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানদের মধ্যে দূরত্ব বা ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছে। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ধর্মযুদ্ধের সময় ধর্মযোদ্ধারা কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে ও তা লুণ্ঠন করে। সপ্তম ধর্মযুদ্ধ (১২৪৯-১২৫৪ খ্রীঃঅঃ) ও অষ্টম ধর্মযুদ্ধকে (১২৭০ খ্রীঃঅঃ) একটা ধর্মীয় তাৎপর্য দেওয়ার সাধু লুইসের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও (তিনি শেষোক্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন), ধর্মযুদ্ধগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুধু এ যুদ্ধগুলোর প্রভাবও ছিল সুদূরপ্রসারী। তা সত্ত্বেও ধর্মযুদ্ধের ধারণা দীর্ঘকাল বজায় ছিল – ষোড়শ শতাব্দী এবং এমন কি সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত। একই শত্রুর মোকাবেলায় একতাবদ্ধ একটি খ্রীষ্টান সমাজের স্বপ্ন দীর্ঘকাল ছিল।

২। ধর্মযুদ্ধ থেকে ধর্মপ্রচার

ইউরোপ বাণীপ্রচার কার্যের সম্পূর্ণতা লাভ

খ্রীষ্টান সমাজ যে শুধু অখ্রীষ্টানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তা নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় একটিজাতিসমূহের এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রুশীয়দের মত জনগোষ্ঠির ধর্মান্তরের মাধ্যমে বাণী প্রচার কার্য সম্পূর্ণতা লাভ করে।

প্ররোচিতকরণ ও অন্যদের সম্পর্কে জ্ঞান

বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধের ব্যর্থতা মানুষের মন পরিবর্তনের কারণ হয়ে ওঠে। মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার চেয়ে তাদেরকে যুক্তি বা উপদেশ সহযোগে প্ররোচিত করা আরও ভাল হবে না কি? পঞ্চম ধর্মযুদ্ধের সময় (১২১৮ খ্রীঃঅঃ) আসিসির ফ্রান্সিস মিশরের সুলতানের সঙ্গে দেখা করেন। রেমণ্ড লুল নামে একজন স্পেনিশ ফ্রান্সিসকান মনে করেন ধর্মান্তরিতকরণ হচ্ছে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা অর্জিত ভালবাসার কাজ। বাণীপ্রচারক যাদের সংস্পর্শে আসে বাণীপ্রচারক তাদের ভাষা, বিশ্বাস ও মতধারা বুঝতে হয়। এ কারণেই রেমণ্ড বিদেশী ভাষা শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

চীনে প্রথম খ্রীষ্টমণ্ডলী

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পৌত্তলিক মোঙ্গলরা সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত ত্রাসের বীজ বপন করে। তখন বাজারে এই মর্মে গুজব প্রচলিত ছিল যে, তাদের মধ্যে অনেক খ্রীষ্টান আছে। এটা ছিল প্রেষ্টার জনের কল্পকাহিনী। তাদের সহায়তায় ইসলামকে পশ্চাদ্‌দিক থেকে আক্রমণ করা সম্ভব নয় কি? পোপ চতুর্থ ইন্নোসেন্ট এবং রাজা সাধু লুইন ফ্রান্সিসকান প্লানকারপিন-এর জন ও উইলিয়াম রাবব্রুকের নেতৃত্বে রাজদূতগণদের সেখানে প্রেরণ করেন।

তারপর প্রকৃতই ধর্মপ্রচারকগণ তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী নাম ধারণ ক'রে দূর দেশগুলোতে প্রচারাভিযানের জন্য নিজেদেরকে যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুত করেন – এদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ফ্রান্সিসকান ও ডমিনিকানগণ। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁদেরকে পরবর্তীকালে মধ্য এশিয়া, পারস্য উপসাগর, ভারত এবং সুদূর চীনে পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। যাত্রাপথে পারস্যের ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নেস্তরিয়াসপন্থী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়।

ল্যাটিনপন্থী ও এ সকল প্রাচ্যের খ্রীষ্টানদের মধ্যে অতটা সমঝোতা ছিল না। পলো ভাইদের, মার্কোর পিতা ও কাকার মধ্যস্থতায় চীনের সম্রাট মোঙ্গল খান পোপ মহোদয়ের কাছে ধর্মপ্রচারক চেয়ে পাঠান। মন্তে কর্ভিনোর ফ্রান্সিসকান জন ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে খানবালিকে (পিকিং) এসে পৌঁছেন, এবং সেখান থেকে ইউরোপে একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লিখে পাঠান। পরে তিনিই হয়েছিলেন পিকিং-এর প্রথম মহাধর্মপাল। সুদীর্ঘ যাত্রা ও রাজনৈতিক নানা অসুবিধার কারণে পরবর্তীকালে চীনা এই প্রথম মণ্ডলীটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

চীনের সম্রাট মোঙ্গল খানকে পোলো ভাইদের ক্রুশ ও মঙ্গলসমাচার পুস্তক প্রদান, ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দ

॥২॥ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি খ্রীষ্টান সমাজ

খ্রীষ্টান সমাজ ছিল একটি নিখুঁত সমাজ যেখানে সব সময় ঐকমত্য ছিল – এমনটা মনে করা উচিত হবে না। তার মাত্রাতিরিক্ত জাগতিক সাফল্যের দিকে প্রাতিষ্ঠানিক মণ্ডলী সুসমাচারের নামে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। উপরন্তু, মধ্যযুগের ইউরোপ কোন আবদ্ধ জগৎ ছিল না। বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদ অবাধে প্রচারিত হত, এবং এর কোন কোনটা খ্রীষ্টধর্মের চাইতেও পুরাতন ও এর পরিপন্থীও ছিল। কিন্তু যেহেতু খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাস ছিল তখন সমাজের সংহতিশক্তিস্বরূপ, তাই যারা প্রচলিত ধর্ম মানত না, তাদেরকে দিনে দিনে কম সহ্য করত এবং সমাজের ভিত্তি হেয় করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হত।

১। ইহুদীরা

জনপ্রিয় সহিংসতা

সর্বাগ্রে আমরা ইহুদীদের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেব। ইহুদী সম্প্রদায় স্পেন থেকে শুরু ক'রে রাইন নদীর আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। খ্রীষ্টমণ্ডলীর শুরু থেকে ইহুদী-বিরোধী বিতর্কের অভাব ছিল না। যদিও এ বিতর্ককে ধর্মতাত্ত্বিক বলে দাবি করা হত, তা সত্ত্বেও এর মধ্যে খ্রীষ্টীয় দয়া-ধর্মের বড্ড অভাব ছিল ! স্পেনে ইহুদীদের কখনই সুনজরে দেখা হত না। মুসলমানদের হাত থেকে স্পেন পুনর্দখলের পর ইহুদীদের জোর ক'রে ধর্মান্তরিত করা হয় – তবে অন্যত্র তাদেরকে ভালভাবেই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ অবস্থার অবনতি ঘটে বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধের সময়। যেহেতু ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টশত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাই জনতা তাদেরকেই আক্রমণ করত যাদেরকে তারা খ্রীষ্টের মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করত ও সারাসিন বা তুর্কীদের চেয়ে বেশী তাদের হাতের নাগালে পেত। সাধু বার্ণাড এই সহিংসতা বন্ধ করতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও রাইন নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বরাবর নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

বৈষম্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন

তৃতীয় ও চতুর্থ লাটেরান মহাসভা (১১৭৯ ও ১২১৫ খ্রীঃঅঃ) ইহুদীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন বা বিধানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ঃ তাদেরকে স্বাতন্ত্র্যসূচক বিশেষ পোষাক পরতে হয় (এক টুকরা হলুদ কাপড় ও একটি তীক্ষ্ণাগ্র টুপি); কোন কোন বৃত্তি বা জীবিকা অর্জনের উপায় এবং খ্রীষ্টানদের সঙ্গে বিয়ে-সাদি নিষিদ্ধ হয়; তাদেরকে কোন

নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করতে হয় এবং কোন কোন দেশ থেকে তাদের বহিষ্কারও করা হয়। সময় সময় তাদের জন্য অবমাননাকর প্রথাও প্রচলিত ছিল ঃ দৃষ্টান্তস্বরূপ, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুলুসে পুণ্য শুক্রবার দিন একজন ইহুদীকে গীর্জায় এক থাপ্পড় খাওয়ার জন্য নিজেকে উপস্থাপন করতে হত। জমিতে কাজ করার অনুমতি ছিল না ব'লে ইহুদীরা শহরে গিয়ে ভীড় করে। সেখানে তারা ব্যবসাপাতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করে। খ্রীষ্টানরা সুদসমেত ধারদেনার ব্যবসা করতে চাইত না – এটাকে তারা সুদের কারবার মনে করত। কিন্তু তারা প্রায়ই এ ব্যাপারে ইহুদীদের শরনাপন্ন হত যাতে অন্যেরা তাদের পাপের বোঝা নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করে। এ সব ব্যাপারে পোপের ভূমিকা ছিল দুর্বোধ্য ঃ একদিকে ধর্মবিশ্বাস দূষিত হওয়ার ভয়ে পোপতন্ত্র বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়নের কাজ করছিল, অপরদিকে সহিংসতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে ইহুদীদের প্রতি অন্যান্য রাজ-রাজাদের চেয়ে বেশী ভাল ব্যবহার করেছিল।

[১১৯] ওয়ালডেন্সেস বা লিয়োন্স-এর গরীব মানুষেরা

ভিন্নমতালম্বী গোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যক অভ্যন্তরীণ দলিলপত্র ধর্মীয় তদন্তকারীদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্তদের সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদেরকে প্রায়ই ধর্মীয় তদন্তকারীদের শরনাপন্ন হতে হয়। স্পষ্টতঃ তাদের বক্তব্য সর্বদাই বিদ্বেষপূর্ণ।

"ওয়ালডেন্সেস বা লিয়োন্স-এর গরীব মানুষদের উপদল ভ্রান্তমতের উৎপত্তি হয় ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। এর জন্য যিনি দায়ী, তিনি ছিলেন লিয়োন্স-এর বাসিন্দা ভালডেস বা ওয়ালডো – এ থেকে এ সমস্ত উপদলীয় সদস্য বা সমর্থকদের নামকরণ হয়। তিনি ছিলেন ধনী কিন্তু তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে তিনি প্রেরিতশিষ্যদের অনুকরণে দরিদ্রতা পালন ও মঙ্গলসমাচার নির্দেশিত জীবনযাপন করার পরিকল্পনা করেন। তিনি সাধু আগস্তিন, সাধু জেরোম ও সাধু গ্রেগরীর কিছু উক্তিসহ মঙ্গলসমাচারগুলো সাধু আম্ব্রোস ও বাইবেলের কিছু পুস্তক তাঁর ব্যবহারের জন্য দেশী ভাষায় অনুবাদ করান। এগুলোকে তিনি শিরোনাম অনুযায়ী সাজান যাকে তিনি ও তাঁর সমর্থকগণ "Sentences" বলে অভিহিত করত। তারা এগুলো ঘন ঘন পাঠ করত বটে, কিন্তু খুব একটা বুঝতে পারত না। তা সত্ত্বেও তারা খুব একটা শিক্ষিত না হলেও মোহে পড়ে তারা প্রেরিতশিষ্যদের দায়িত্ব জবরদখল করে নেয় এবং রাস্তাঘাটে ও প্রকাশ্য স্থানে সুসমাচার প্রচারের দুঃসাহস প্রদর্শন করে। পূর্বোক্ত ভালডেস বা ওয়ালডো এভাবে ধৃষ্টতাপূর্ণ পন্থায় তার দুষ্কর্মের অসংখ্য সহযোগী নারী-পুরুষকে একাজে জড়িত করেন এবং তাদেরকে শিষ্যরূপে প্রচার করতে বাইরে পাঠান।

লিয়োন্স-এর মহাধর্মপাল নির্দোষ মহামান্য জন তাদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাদেরকে অমন ধৃষ্ট হতে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করে এবং এই যুক্তি দেখিয়ে তাদের নির্বুদ্ধিতাকে কম গুরুতর রূপে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে যে, মানুষের চেয়ে বরং ঈশ্বরের কথাই তাদের মেনে চলতে হয়। ঈশ্বর এই মর্মে আদেশ দান করেছেন যে, প্রেরিতশিষ্যগণই সকলের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করবেন। প্রেরিতশিষ্যদের সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা-ই তারা নিজেদের বেলায় প্রয়োগ ক'রে তার পুনরাবৃত্তি করে। তারা এমনকি একটি মিথ্যা দরিদ্রতা ব্রত গ্রহণের দ্বারা ও পবিত্রতার ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে হঠকারিতাপূর্বক নিজেদেরকে প্রেরিতশিষ্যদের অনুসরণকারী ও উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করে। প্রকৃতপক্ষে তারা ধর্মাধ্যক্ষ ও যাজকদের অবজ্ঞা করে কারণ তারা বলে থাকে এদের নাকি প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে ও তারা নাকি ভোগবিলাসের মধ্যে জীবন যাপন ক'রে থাকে।

তাদেরকে প্রকাশ্যে বক্তব্য প্রদান বাদ দিতে বলা হলে তারা এ নির্দেশ অমান্য করে। তখন তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহী ও বেপরোয়া ঘোষণা করা হয়। ফলে তারা মণ্ডলীচ্যুত হয় ও তাদের নিজ শহর ও জন্মভূমি থেকে বহিষ্কৃত হয়।

মণ্ডলীর কর্তৃত্বের অবজ্ঞা ও অবমাননা আগেও ছিল এবং আজও রয়েছে আর তা হল ওয়ালডেন্সেদের প্রধান ভ্রান্ত ধর্মমত। ... তাদের মতে আইনের ক্ষেত্রে কিংবা অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে, কোন ব্যতিক্রম বা ব্যাখ্যা অস্বীকার করে, শপথ করা ঈশ্বর কর্তৃক নিষিদ্ধ ...।"

বার্ণাড গি, ১২৬০-১৩৩১ খ্রীঃ অঃ, তদন্তকারী বিচারকের গ্রন্থ, II. 1f.

২। সুসমাচার ও ভিন্নমতের প্রকাশ

আমরা মধ্যযুগের ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের অতি সহজে অচিরেই ভ্রান্ত ধর্মমতবাদীদের শ্রেণীতে ভুক্ত করে ফেলি। আমরা প্রায়ই তাদের কথা জানি মণ্ডলী স্বীকৃত উৎসসমূহের মাধ্যমে, বিশেষ ক'রে ধর্মীয় দণ্ডব্যবস্থার তদন্তের মাধ্যমে যা নাকি তাদেরকে খুব একটা ভাল দৃষ্টিতে তুলে ধরে না। তাদের লেখার অধিকাংশই আজ হারিয়ে গেছে, আর জনশ্রুতিকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই। আদি খ্রীষ্টানদের বেলায় যেমনটা ঘটেছে, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিষয়ে গুজব লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়ে অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে।

মঙ্গলসমাচারসম্মত এক প্রতিবাদ

প্রথম প্রথম উপরোক্ত ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠীর অনেকেই খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিরুদ্ধে মঙ্গলসমাচারসম্মত এক প্রতিবাদে মুখর ছিল, কেননা মণ্ডলী এ সময় অত্যধিক বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল। গ্রেগরীয় সংস্কার কিছুটা সুফল বইয়ে এনেছিল। যাজকদের অনেকেই তখন ভীষণ লোভী ছিলেন বা তারা উপপত্নী গ্রহণ করতেন। তাই অপেক্ষাকৃত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন খ্রীষ্টানরা এ ধরনের যাজকদের সম্পর্কে নির্দ্বিধায় নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে ছাড়ত না। অনেকে মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত খ্রীষ্টের দরিদ্রতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মানসে প্রাতিষ্ঠানিক মণ্ডলীর কাছে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করে। এসব বিরোধী আন্দোলনের উৎপত্তি হত প্রায়ই বিভিন্ন শহরে। শহরগুলো দ্বাদশ শতাব্দীতে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। খ্রীষ্টমণ্ডলী অত্যধিক সামন্ততান্ত্রিক ও ভীষণ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অব্রতধারী যাজকের এবং তাদের মঠাশ্রমে আবদ্ধ নির্জনবাসী সন্ন্যাসীগণ শহরবাসীদের আধ্যাত্মিক ও মনোজাগতিক কোন চাহিদা-প্রয়োজন আর মিটাতে পারছিল না। তাই তাদের অনেকে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর বাইরে এসে তাদের নিজস্ব দল গঠন করেন।

ভালডেস ও লিয়োন্স-এর গরীব মানুষেরা

সুসমাচারের শিক্ষাসম্মত আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম সুপরিচিত আন্দোলন হচ্ছে – ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পিটার
[১১৯] ভালডেস বা ওয়ালডো কর্তৃক সূচিত আন্দোলনটি। একজন ধনী বণিক ভালডেস তার ধনসম্পদের উৎসের ব্যাপারে স্বস্তি না পেয়ে তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ ক'রে তার সহ-নাগরিকদের কাছে দরিদ্রতার কথা প্রচার করতে থাকেন। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে তার সঙ্গে যোগ দিল; তারা নিজ ভাষায় প্রার্থনা করে, ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে, ও প্রকাশ্য স্থানে এই কথা প্রচার করতে থাকে, "তোমরা ঈশ্বর ও ধনসম্পদ – এই দু' মনিবের সেবা একই সঙ্গে করতে পার না।" কর্তৃপক্ষমহল এতে অসন্তুষ্ট হন, কেননা উক্ত আন্দোলনের সভ্য-সভ্যারা ধর্মযাজক না হয়েও প্রচার করছিল এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছিল। পোপ মহোদয়, ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এ ব্যাপারে যার সঙ্গে তারা সলা-পরামর্শ করেছিল, তিনি উক্ত আন্দোলনের সভ্য-সভ্যাদের প্রচারকার্যের অনুমতি প্রদান করার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন লিয়োন্সের মহাধর্মপালদের উপর। তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন আর ওয়ালডেন্সীয়রা ভ্রান্ত ধর্মমতবাদীদের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে। তারা সারা ল্যাঙ্গুয়েডক, প্রভেন্স ও উত্তর ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে। ঐশবাণীর দাবির প্রতি মানুষের বিবেক জাগ্রত হোক – ভালডেস শুধু এটাই চেয়েছিলেন। প্রান্তিক ও অবহেলিত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল বলে অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে ওয়ালডেসপন্থীদের পরিচয় হয় ও তাদের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট হয়। খ্রীষ্টমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তারা প্রাতিষ্ঠানিক মণ্ডলীর প্রয়োজনকে অস্বীকার করে। তারা বলে যে শুধু পবিত্র জীবন যাপনের মাধ্যমে মণ্ডলীর প্রকৃত যাজক হওয়া যায়। তারা শুধুমাত্র সকল খ্রীষ্টভক্তদের যাজকত্বকেই স্বীকৃতি দেয়। ধনসম্পদ অর্জনের প্রত্যাশায় কৃত শ্রমের বিরোধী ছিল তারা এবং এর সঙ্গে শপথ নেওয়া ও মৃত্যুদণ্ড অস্বীকার করে।

এক উন্নততর বিশ্বের প্রত্যাশা

অন্যান্য আরও কিছু আন্দোলন মঙ্গলসমাচারের মূলমন্ত্রে ও আদি মণ্ডলীর আদর্শে ফিরে যেতে প্রত্যাশী ছিল। তারা বাইবেলের প্রত্যাদেশ-গ্রন্থ ও প্রবক্তাদের রচনাবলী থেকে প্রেরণা নিয়ে মানব জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে নানা কল্পনা করত। এই আন্দোলনগুলো প্রত্যাদেশীয় বা সহস্রবাদী আন্দোলনরূপে পরিচিত (দ্রঃ প্রত্যাদেশ ২০:৪-৬)। অন্যায়-অবিচারে পরিপূর্ণ এক কষ্টকর সমাজে অবস্থান ক'রে কিছু লোক এমন এক ন্যায়ধর্মী রাজ্যের আগমন প্রতীক্ষায় ছিল

যেখানে মানুষের পদমর্যাদা আগাগোড়া উল্টে-পাল্টে যাবে। সম্ভবতঃ এটাই ছিল বিভিন্ন বিপ্লবের সূচনা-বিন্দু এমন লোকদের দ্বারা সৃষ্ট যারা পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে দাবী করত। ফিওরের যোয়াকিম নামে (১১৩০-১২০২ খ্রীঃঅঃ) কালাব্রিয়ার একজন নির্জনবাসী পুণ্যাত্মা সন্ন্যাসীর লেখা এ সমস্ত স্বপ্নে ইন্ধন যুগিয়েছিল। পিতার যুগের (পুরাতন নিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) ও পুত্রের যুগের (খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) পর, পবিত্র আত্মার শাশ্বত যুগের শুরু হবে, তারা নতুন যুগে বর্তমান মণ্ডলীর ভূমিকাকে ছোট ক'রে ফেলত।

ক্যাথারপন্থীরা

সবশেষে, কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের পরিপন্থী মতবাদেরও উদ্ভব ঘটে, দৃষ্টান্তস্বরূপ – ক্যাথারপন্থীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গোষ্ঠীটি সমগ্র ল্যাঙ্গুয়েডক ও উত্তর ইটালীতে বিস্তার লাভ করেছিল। তাদেরকে প্রাচীন সেই মানিকীদের উত্তরাধিকারী ব'লে মনে করা হত, কিন্তু দু'গোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র নির্ধারণ করা খুব সহজ কাজ নয়। ধর্মীয় তীর্থযাত্রা ও ধর্মযুদ্ধসমূহ নিঃসন্দেহে এদের মতবাদ বিস্তারে সহায়তা করেছে। ক্যাথারপন্থীরা (বিশুদ্ধ) এক ধরনের দ্বৈতবাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত যা বার্ণাড গি যেমনটা বলেছেন ততটা চরমপন্থী ছিল [১২০]

[১২০] নতুন মানিকীয়রা বা ক্যাথারপন্থীরা

পূর্ববর্তী পাঠাংশটিতে দেয়া একই মন্তব্য এখানেও করা চলে। যাদের ক্যাথারি বলা হত, তাদের মতবাদ সর্বদা অত চরমপন্থী ছিল না।

"মানিকীয়দের সম্প্রদায়, ভ্রান্ত মত ও বিভ্রান্ত সমর্থকরা দুই ঈশ্বর বা দুই প্রভুকে স্বীকার করে যথা – একজন উত্তম ঈশ্বর ও একজন মন্দ ঈশ্বর। তারা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে যে, দৃশ্যমান ও বস্তুজগতের সৃষ্টি স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের – যাঁকে তারা ব'লে থাকে উত্তম ঈশ্বর - তাঁর কর্ম নয়, বরং মন্দ আত্মা ও শয়তান তথা মন্দ ঈশ্বরের কর্ম। এভাবেই তারা দুই সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ ঈশ্বর ও শয়তান, এবং দুই সৃষ্টি অর্থাৎ অদৃশ্য ও অশরীরী সত্তার সৃষ্টি আর দৃশ্যমান ও বস্তুজগতের সৃষ্টির মধ্যে তফাৎ ক'রে থাকে।

অনুরূপভাবে তারা দুই মণ্ডলীর কল্পনা ক'রে, যথা – একটি উত্তম মণ্ডলী, অর্থাৎ তাদের উপদলটি; এটাকে তারা যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত মণ্ডলী ব'লে দাবি ক'রে থাকে। তাদের মতে, অপরটি হচ্ছে মন্দ মণ্ডলী তথা রোমীয় মণ্ডলী। তারা ধৃষ্টতার সঙ্গে এটাকে ব্যভিচারের মাতা, মহাব্যাবিলন, বেশ্যা ও শয়তানের মহামন্দির, শয়তানের সমাজগৃহ ব'লে থাকে।

জলে দীক্ষাস্নানের বিকল্পরূপে তারা অপর একটি দীক্ষাস্নান, আধ্যাত্মিক দীক্ষাস্নান – যাকে বলা হয় পবিত্র আত্মার Consolamentum – দিয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ – যখন তারা সুস্থ বা অসুস্থ কোন ব্যক্তিকে তাদের উপদলে বা সংঘে গ্রহণ করে তখন তাদের জঘন্য ধর্মাচার অনুযায়ী তার উপর হস্ত স্থাপন ক'রে থাকে। ...

তারা চিরকুমারী মারীয়ার গর্ভে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেহধারণ অস্বীকার করে। তারা যুক্তি দেখিয়ে বলে থাকে যে, মানব স্বভাবগুণে তিনি অন্যান্য মানুষের মত প্রকৃত মানব দেহ

মন্টেগুর দুর্গ আরিয়েজ, ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাথারির একটি আশ্রয় স্থল।

বা প্রকৃত মানুষের রক্ত-মাংস গ্রহণ করেননি। তিনি কোন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেননি এবং ক্রুশে মৃত্যুবরণও করেননি। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হননি, এবং মানবদেহে ও রক্ত-মাংসে স্বর্গারোহণও করেননি। তাদের মতে, এসব শুধু কাল্পনিক দৃশ্য।

যারা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রহণ করে কিন্তু তাদের জীবন ধারা অনুসরণ করে না ও ধর্মাচারসমূহ পালন করে না তাদেরকে অসিদ্ধ ভ্রান্ত ধর্মমতবাদী অভিহিত করা হয়।

পক্ষান্তরে, যারা ভ্রান্ত ধর্মমতবাদীদের বিশ্বাস প্রকাশ করে এবং সে অনুসারে জীবন-যাপন করে, তাদের ধর্মাচার পালন ও মেনে চলে, তাদেরকে তারা বিশুদ্ধ বলে অভিহিত ক'রে থাকে; এরাই অন্যদের কাছে নিজের অন্ধবিশ্বাস জাহির করে ও তাদের নিজের ধর্মমতে দীক্ষিত করে। ..."

বার্ণাড গি, প্রাগোক্ত, I, 1।

না। তারা এমন এক প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল যে প্রশ্ন মানবজাতি প্রাচীনকাল থেকে জিজ্ঞেস ক'রে আসছিল ঃ মন্দতার উৎপত্তি কোথায় ? দ্বৈতবাদের একটা সুবিধা ছিল সহজ-সরল হওয়া। এ কথা বলতেই হয় যে, ক্যাথারপন্থীরা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান ব'লে মনে করত, এমন কি সময় সময় নিজেদেরকে 'পরিপক্ক খ্রীষ্টান' ব'লে পরিচয় দিত। তাদের কিছু কিছু ধর্মাচার প্রাচীন খ্রীষ্টানদের ধর্মাচারের অনুরূপ ছিল। কিন্তু যেহেতু তারা বস্তুজগতকে ও জীবদেহকে মন্দ ব'লে গণ্য করত, তাই তারা খ্রীষ্টের দেহধারণ অস্বীকার করত ও বিবাহকে বাতিল বা ব্যবহারের অযোগ্য ব'লে ঘোষণা করত। বলা বাহুল্য, খ্রীষ্টমণ্ডলী তাদেরকে বিশ্বাসের পক্ষে মারাত্মক বিপদ ব'লে গণ্য করত। কিন্তু প্রশ্ন হল – অদ্ভুত এই মতবাদের সাফল্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ? ল্যাঙ্গুয়েডকের যাজকদের শিথিলতার বিপরীতে ক্যাথারপন্থীদের "বিশুদ্ধ" সেবাকারীদের দরিদ্রতা ও শৃঙ্খলাবোধ লোকদের প্রশংসা লাভ করেছিল। ক্যাথারবাদকে বেছে নেয়াটা ছিল তৎকালীন খ্রীষ্টমণ্ডলীর বাস্তব অবস্থার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদেরই নামান্তর। কিন্তু শুদ্ধ, 'ভাল মানুষেরা' যদিও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করত, তথাপি সাধারণ বিশ্বাসীদের বেলায় দাবি-দাওয়াগুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কম ছিল। তারা দেহের সকল কামনা-বাসনা মিটাতে পারত, বড় দাবী ছিল 'বিশুদ্ধদের' জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করা। পুনর্জন্ম তত্ত্বও ক্যাথারদের আকর্ষণের একটি অন্যতম কারণ ছিল। পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে তাদের তত্ত্ব অনুযায়ী এ জীবনে যাদের দুঃখ-কষ্টে কেটেছে, তারা পরবর্তী জীবনে লাভ করবে পরম সুখ-শান্তি। আর যারা এ জীবনে সুখে কাটিয়েছে, তারা লাভ করবে চরম দুঃখ-কষ্ট।

৩। ভিক্ষাজীবী সংঘসমূহের উৎপত্তি

মঙ্গলসমাচারের মূল আদর্শে ফিরে যাওয়ার তীব্র বাসনা ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠীগুলোর একচেটিয়া ছিল না। তা এক নতুন ধরনের ব্রতীয় জীবন ভিক্ষাজীবী ধর্মসংঘের উৎপত্তিতে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। এ সমস্ত ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণ মঙ্গলসমাচারের আবেদন ও তাঁদের সময়কার মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দিতে উদগ্রীব ছিলেন। বিশেষ ক'রে তারা ভ্রান্ত শিক্ষার ক্রমোবৃদ্ধি, শহরবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বুদ্ধিজীবিদের অস্থিরতার ক্রমবিকাশের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তবে ডমিনিক ও আসিসির ফ্রান্সিসের সাড়াদানগুলো সূচনা থেকে বেশ ভিন্ন রকমের।

ডমিনিক ও বাণী প্রচারক ভিক্ষুগণ

ডমিনিকের জন্ম হয়েছিল ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে স্পেনে। তিনি ছিলেন মূলতঃ ওসমার ক্যাথিড্রালে নিযুক্ত একজন যাজক। তিনি পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিকট বাণীপ্রচার করতে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ল্যাঙ্গয়েডেকের ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিস্টারসীয়দের সঙ্গে এক সাক্ষাৎ তাঁর ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন কেন নির্জনবাসী সন্ন্যাসীগণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা গিয়েছিলেন পোপের প্রতিনিধি হিসাবে, তাই তাঁরা মনে করতেন রাষ্ট্রীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে থেকে প্রত্যাশিত জাঁকজমক বজায় রাখতে তাঁরাও বাধ্য। কিন্তু ক্যাথার প্রচারকদের সাফল্য এসেছিল তাদের একান্ত অনাড়ম্বর জীবন যাপন থেকে। এ থেকে ডমিনিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাণীপ্রচারকদের দরিদ্রতার জীবন-যাপনই হচ্ছে একমাত্র ফলপ্রসূ প্রতিকার। 'দীনহীন খ্রীষ্টের দরিদ্রতাকে অনুকরণ ক'রে' কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি তুলুস অঞ্চলে ভ্রান্ত ধর্মমতবাদীদের মোকাবিলা করতে বেরিয়ে পড়েন, ও তাদের সঙ্গে ধর্মতাত্ত্বিক তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হন। ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে তুলুসের ধর্মপাল বাণীপ্রচারকদের একটি ছোটদলকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রদান করেন ঃ "আমাদের ধর্মপ্রদেশে আমরা ব্রাদার ডমিনিক ও তাঁর সঙ্গীদেরকে বাণীপ্রচারকরূপে স্বীকৃতি দিচ্ছি। তাঁদের বাণীপ্রচারের মূল লক্ষ্য হবে – দুর্নীতি ও ভ্রান্ত শিক্ষার উচ্ছেদ করা, অনাচার দূরীকরণ, বিশ্বাসের বিধান শিক্ষাদান করা ও লোকদের মধ্যে সু-অভ্যাস গঠন করা। তাঁদের জীবনধারা হবে মঙ্গলসমাচারে নির্দেশিত দরিদ্রতা মেনে ব্রতধারীদের মত জীবন-যাপন করা, পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করা, এবং সেই সঙ্গে সত্যের বাণী প্রচার করা।" ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং পোপ মহোদয় "বাণীপ্রচারক ভ্রাতাদের সংঘটিকে" স্বীকৃতি প্রদান করেন। সংঘটি সাধু আগস্তিনের জীবন-বিধান গ্রহণ করে। ডমিনিক ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে বোলগ্নায় মৃত্যুবরণ করেন।

[১২১] ফ্রান্সিসের শেষ ইচ্ছাপত্র /উইল (১২২৬ খ্রীঃঅঃ)

"প্রভু আমাকে অর্থাৎব্রাদার ফ্রান্সিসকে এভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে শুরু করার কৃপা দিয়েছেন ; কেননা আমি যখন পাপের মধ্যে ছিলাম, তখন কুষ্ঠরোগীদের দেখতে আমার খুবই খারাপ লাগত। কিন্তু প্রভু নিজেই আমাকে তাদের মাঝে নিয়ে গেছেন এবং আমি তখন তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে পেরেছিলাম। আমি যখন তাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করলাম, তখন আমার কাছে আগে যা বিরক্তিকর লাগত, তা-ই দেহ ও আত্মার মাধুর্যে পরিণত হয়েছিল। আর এরপর আমি সেখানে কিছুকাল থেকে এ জগতের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসি। প্রভু আমাকে বিভিন্ন গির্জায় এমন বিপুল বিশ্বাস দান করলেন যার দরুণ আমি সরল মনে তাঁর আরাধনা ক'রে বলি, "আমরা এখানে ও এ পৃথিবীর বুকে আমাদের সকল গির্জায়, ওগো প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তোমার আরাধনা করি, তোমার পবিত্র ক্রুশ দ্বারা এ জগতকে মুক্ত করার জন্য তোমার জয়গান করি।"

পবিত্রা রোমীয় মণ্ডলীর বিধান অনুসারে যে সকল ধর্মযাজক জীবন যাপন করেন তাদের ধর্মীয় পদমর্যাদার গুণে বিপুল বিশ্বাস প্রভু আমাকে দিয়েছিলেন এবং এখনও দিচ্ছেন যে, তারা আমাকে নির্যাতন করলেও আমি তাদেরই কাছে আশ্রয় গ্রহণ করব। আমার যদিও সলোমনের ন্যায় জ্ঞান থাকত, আর যদি এমন যাজকদের পেতাম যারা সাংসারিক এবং সত্যিই বেচারা তবুও তারা যে সকল ধর্মপল্লীতে বসবাস করেন, সেখানে আমি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রচার করতাম না ...।

পাখীদের কাছে সাধু ফ্রান্সিসের বাণীপ্রচার। ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজী পাণ্ডুলিপি থেকে।

আর প্রভু যখন আমাকে ধর্মভাইদের দিলেন, তখন আমাকে কি করতে হবে বা না হবে, তা কেউ আমাকে দেখিয়ে দিত না। পরাৎপরই আমার কাছে প্রকাশ করলেন যে, আমাকে পবিত্র মঙ্গলসমাচারের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। আর আমি তা কয়েকটি সরল কথায় লিখাই, এবং মহামান্য পোপ তা সমর্থন ও অনুমোদন করেন। আর যারা এ জীবন অবলম্বন করতে আসত, তাদের যা ছিল গরীবদের দান করত; তাদের ভিতরে-বাইরে ইচ্ছেমত তালি দেওয়া একটিমাত্র জোব্বা, একটি কোমরবন্ধন ও প্যান্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। আর আমরা এর বেশী কিছু চাইতামও না। যাজকরা যারা অন্যান্য যাজকদের মত প্রাহরিক প্রার্থনা করেন, অ-যাজকীয় ব্রাদারগণ প্রভুর প্রার্থনা বলেন এবং অনেকটা ইচ্ছে করেই গীর্জায় বাস করতেন। আর আমরা ছিলাম সহজ-সরল এবং সকলের অনুগত। আর আমি নিজ হাতে কাজ করতাম এবং এখনও করব। আমার একান্ত ইচ্ছা অন্যান্য সকল ভিক্ষুই সততার সাথে কোন না কোন কায়িক পরিশ্রম করুক। যারা কায়িক পরিশ্রম করতে জানে না, তারা তা শিখুক তাদের পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিক পাবার আশায় নয়, কিন্তু সু-দৃষ্টান্ত স্থাপন ও আলস্যকে দূর করারই জন্য। আর তারা যখন আমাদের শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক না দেয়, তখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে যেন আমরা প্রভুর সাহায্য যাচ্ঞা করি। প্রভু আমাকে জানিয়েছেন আমরা যেন এই সম্ভাষণটি ব্যবহার করি, "প্রভু তোমায় শান্তি দান করুন"।

আমাদের ধর্মভাইয়েরা অতি সাবধানে থাকবে যেন তাদের জন্য নির্মিত গীর্জা, দরিদ্র নিবাস কিংবা অন্য কোন স্থান গ্রহণ করবে না যদি না এসব আমাদের নিয়ম-বিধান অনুসারে পবিত্র দরিদ্রতার ব্রত অনুযায়ী না হয়, এবং যেন সেখানে বাস করি এই পৃথিবীর ক্ষণিকের অতিথি ও তীর্থযাত্রীর মত। বাধ্যতার ব্রতধারী ধর্মভ্রাতাগণ যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমি তাদের প্রত্যেককে কঠোরভাবে নিষেধ করছি তারা যেন নিজেরা কিংবা অন্য কারোর মধ্যস্থতায় রোমের দরবারে কোন চিঠিপত্র চাওয়ার দুঃসাহস না করে – কোন গীর্জা বা অন্য কোন স্থানের জন্য হোক, ধর্মপ্রচারের জন্য কিংবা তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের জন্য হোক। তারা যদি কোথাও সাদরে গৃহীত না হন, তাহলে তারা যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য অন্যত্র চলে যান।

আমি এই ভ্রাতৃসংঘের মিনিষ্টার জেনারেল ও যে তত্ত্বাবধায়ককে তিনি আমাকে দান করবেন তাদের বাধ্য থাকতে একান্তভাবে ইচ্ছা করি।

আর ধর্ম ভাইরা যেন এই কথা না বলেন, "এটা ভিন্ন নিয়ম।" বস্তুতঃ এটি একটি স্মারকবস্তু, একটি সতর্কবাণী, একটি পরামর্শ বিশেষ; এটি আমার শেষ ইচ্ছাপত্র/ উইল যা আমি, দীনহীন ব্রাদার ফ্রান্সিস, আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি যাতে আমরা প্রভুর চরণে যে নিয়ম মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করেছি, তা যেন অপেক্ষাকৃত উদারভাবে মেনে চলি। আর মিনিষ্টার জেনারেল এবং অন্য সকল সেবাকারী ও তত্ত্বাবধায়ক বাধ্যতার ব্রতে আবদ্ধ হওয়ার কারণে এ সমস্ত কথা থেকে কোন কিছু যেন বাদ না দেন বা কোন কিছু যোগ না করেন।...

আর যিনি এ সমস্ত বিষয় মেনে চলবেন, তিনি স্বর্গ থেকে মহামহিম পিতার আশীর্বাদে পূর্ণ হোন, এবং এ পৃথিবীতে তাঁরই প্রিয় পুত্রের ও পরম সহায়ক পবিত্র আত্মার এবং স্বর্গের ও সকল সাধু-সাধ্বীর শক্তিতে পূর্ণ হোন। আর আমি, ব্রাদার ফ্রান্সিস, তোমাদের দীনহীন সেবক, এই পবিত্র আশীর্বাদের অধিকারী না হয়েও আমি তা তোমাদের জন্য আমার সাধ্যমত দৃঢ়ভাবে বলবৎ করছি।

সমাজের বুকে উপস্থিতি

বাণীপ্রচারক ভ্রাতৃগণ শহরের ছোট ছোট সম্প্রদায়ে মিতব্যয়িতার সঙ্গে বাস করতেন। তাঁরা ধর্মপ্রচার ও অধ্যয়নের মধ্যে তাদের সময়কে ভাগ ক'রে নিতেন। গ্রামীণ পরিষদের কাঠামো অনুকরণ ক'রে সংঘের কাঠামোটি ছিল গণতান্ত্রিক ধরনের। নির্বাচনের মাধ্যমেই মাত্র সংঘের বিভিন্ন পদগুলো অলঙ্কৃত হত এবং তা ছিল সাময়িক। একমাত্র সংঘের প্রধান সারা জীবনের জন্য নির্বাচিত হতেন। তাঁরা কঠোর সন্ন্যাসব্রতীদের বড় বড় গৃহ/আবাস থেকে কোন রাজস্ব পেত না; কিন্তু তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মানুষের দয়ার উপর নির্ভর করতেন। এ কারণেই তাঁদেরকে ভিক্ষাজীবী ধর্মসংঘ রূপে অভিহিত করা হত। তাঁরা তাঁদের ধর্ম প্রচারকার্য করেন বিশেষ ক'রে শহরের লোক ও বিভিন্ন বৃত্তিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের কাছে ও বিদ্যালয়ে। পোপ মহোদয় ধর্মীয় তদন্ত তাঁদের দায়িত্বে ন্যস্ত ক'রে তাঁদেরকে ভ্রান্ত শিক্ষা দমন করার দায়িত্ব প্রদান করেন।

ফ্রান্সিস ও গৌণ ভ্রাতৃগণ

[১২১] আসিসির ফ্রান্সিসের প্রাথমিক জীবনধারা অনেকটা ভালডেস-এর জীবনধারার মতই ছিল। তাঁর ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ইচ্ছাপত্র/ উইলে ফ্রান্সিস তাঁর জীবনের পথে অগ্রগতির প্রধান প্রধান ধাপগুলোর একটি রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তাঁর জন্ম হয় ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে। একজন ধনী বণিকের পুত্র হয়েও ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দরিদ্রতা দেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে তাঁর বীরধর্মের স্বপ্ন পরিত্যাগ করেন। একজন কুষ্ঠরোগীর মধ্যে তিনি দীনদরিদ্র খ্রীষ্টকে দেখতে পান। তিনি বিশ্বাস করতেন সবার আগে খ্রীষ্ট তাঁকে বিভিন্ন গীর্জা যেমন – সাধু দামিয়ানের গীর্জাটি – পুনঃনির্মাণ করতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। পিতাকে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি তাঁর কাপড়-চোপড় পর্যন্ত দান ক'রে দিয়ে তিনি তাঁর খাবার-দাবার ও প্রয়োজনীয় সব কিছু মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা করে আনতেন। তাঁর জীবন ছিল একজন মরুবাসী সন্ন্যাসীরই মত। কিন্তু ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তিয়ানকোলার গীর্জায় তিনি মঙ্গলসমাচারের যে বার্তা শুনেছিলেন তা তাঁর কাছে একটি প্রত্যাদেশস্বরূপ এসেছিল ঃ "তুমি যাও আর এই কথা প্রচার কর, ঐশরাজ্য সন্নিকট। সোনা-রূপা তোমার সঙ্গে কিছুই নিও না ...।" কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি রাজপথে ও বিভিন্ন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন এবং আনন্দের সঙ্গে শান্তির সু-সংবাদ প্রচার করতে থাকেন। তিনি হয় কাজ ক'রে খাদ্য সংগ্রহ করতেন নতুবা তা ভিক্ষা ক'রে আনতেন, এবং তাঁর আগে ভালডেস ও অন্যান্য অনেকে যা করেছিলেন তিনি তাই করতেন। একজন ধর্মযাজক না হয়েও তিনি বাণীপ্রচার করতেন। তবে যাজকদের বা খ্রীষ্টমণ্ডলীকে বিচার করার কোন ইচ্ছা ফ্রান্সিসের ছিল না। তিনি শুধু চাইতেন প্যালেষ্টইনে যীশু যেমনটি করেছিলেন, তদ্রূপ সুসমাচারের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে মানুষ স্বাধীনতা লাভ করুক। ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট যারা নিজেদেরকে 'নিম্ন পর্যায়ের' সামাজিক সিঁড়ির সর্বনিম্ন ধাপ ব'লে গণ্য করতেন, তাদের জীবন-পদ্ধতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এরা নীতি-বিষয়ক প্রচারের মধ্যেই শুধু নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতেন।

শান্তি ও আনন্দ

১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিসের মাত্র এক ডজনের মত সঙ্গী ছিল। দশ বছর পর তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০০০। ১২১২ খ্রীষ্টাব্দে ক্লেয়ার ও তাঁর সঙ্গিনীগণ ফ্রান্সিসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ফ্রান্সিসের অনুগত ধর্মভ্রাতৃগণ কয়েকটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েন। ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস পুণ্যভূমিতে গিয়ে সেখানে মিশরের সুলতানকে মন পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। ধর্মভাইদের মধ্যে কেউ কেউ কনভেন্ট ও অধ্যয়নগৃহ সংবলিত একটি কঠোর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্ত ফ্রান্সিস তাতে সায় দেননি। তবে, যদিও মঙ্গলসমাচারই ছিল তাদের জীবন-বিধান, তথাপি তাদেরকে একটি নিয়মাবলী রচনা করতে হয়েছিল (১২২৩ খ্রীঃঅঃ)। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর আনন্দপূর্ণ প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন। ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি সত্যিকার জীবন্ত গোশালাসহ বড়দিন উদ্‌যাপন করেন। পরের বছরই তাঁর দেহে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ক্ষতচিহ্নের অনুরূপ ক্ষতচিহ্ন দেখা দেয়। তিনি তাঁর ভ্রাতা সূর্যের স্তবকীর্তনে প্রকৃতি ও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অনুপম ভালবাসা প্রকাশ করেন। স্থানীয় সামন্তরাজদের মধ্যে তিনি মধ্যস্থতাকারীরূপে কাজ করতেন। ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই রচিত শেষ ইচ্ছাপত্র/উইলে তাঁর ব্রত জীবনের আরম্ভের প্রতি কিছুটা আকুলতা লক্ষ্য

করা যায়। ৩রা অক্টোবর ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধীরশান্তভাবে 'আমাদের ভগ্নী, দৈহিক মৃত্যুকে' সাদরে বরণ করেন। এরই দু'বছর পর তাঁকে সাধু ব'লে ঘোষণা করা হয়।

গৌণ ভ্রাতৃগণের ধর্মসংঘটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটি সহজ ব্যাপার ছিল না, এমন কি এর প্রতিষ্ঠাতার আদি প্রেরণার বিষয় নিয়ে সংঘের মধ্যে মতবিরোধও দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও ফ্রান্সিস বরাবরই মধ্যযুগের, এমনকি ইতিহাসেও সবচেয়ে জনপ্রিয় সাধু ব'লে পরিচিত ছিলেন এবং এখনও আছেন। মঙ্গলবার্তার মূল আদর্শে ফিরে যাওয়ার মহোত্তম সাক্ষী ফ্রান্সিস তাঁর খ্রীষ্টের জীবন অনুকরণ, প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালবাসা এবং মানব সম্পর্ককে বিকৃত ক'রে ফেলে যে ধন-সম্পদ, তা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে তিনি মধ্যযুগের প্রচলিত মনোভাবের ও মূল্যবোধের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন।

॥৩ ॥ভ্রান্ত শিক্ষা দমন

ধর্মীয় তদন্ত/দণ্ডব্যবস্থা মধ্যযুগের সময়কার ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বজনীন মনোভাব তুলে ধরে না। কয়েক শতাব্দী ধরে তাদেরকে নিয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলীতে অনেক দ্বিধা ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসেই মাত্র সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজের জন্য একটি সু-বিন্যস্ত দমননীতির পরিকল্পনা করা হয়।

১। দ্বিধাগ্রস্ততা ও চেপে রাখা মনোভাব

আমরা আগেই যেমনটা দেখেছি, খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের অধীনে ভ্রান্ত শিক্ষা-বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। [৫৭] আগস্তিন বা জন ক্রীসোস্তমের ন্যায় ধর্মপালগণও সেই আইন মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ভ্রান্ত মতবাদীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধানকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দমনমূলক বিভিন্ন আইন থাকা সত্ত্বেও একাদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত খ্রীষ্টমণ্ডলী বরাবরই ভ্রান্ত মতবাদীদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করার ব্যাপারে অনিচ্ছাই প্রদর্শন ক'রে এসেছে। মধ্যযুগের প্রথমার্দ্ধে ভ্রান্ত মতবাদীদের বিরুদ্ধে কোন মৃত্যুদণ্ড প্রদানের কথা জানা যায় না, শুধুমাত্র কারাদণ্ড প্রদানের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

বিভিন্ন লোকগ্রাহ্য আন্দোলন ও ক্রমবর্ধমান কঠোরতা

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। ভিন্নমতাবলম্বীদের সংখ্যা তখন বেড়েই যাচ্ছিল ব'লে মনে হল। খ্রীষ্টান সমাজ নিজের সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হচ্ছিল। বিশ্বাসের ঐক্যই ছিল সমাজের ভিত্তি, আর তাকে যে কোন মূল্যেই হোক রক্ষা করতেই হবে। রোমীয় আইন পুনরায় কার্যকর করা হয়। লোকেরা এর মধ্যে ভ্রান্ত শিক্ষা-বিরোধী বিভিন্ন আইন-কানুন খুঁজে পেল। কিন্তু সেই আইন-কানুন শুরুতে কিভাবে প্রয়োগ করা হত বা না হত – এ নিয়ে কেউ মোটেও মাথা ঘামাত না। অথচ এর প্রয়োগ কিন্তু দিন দিন বৃদ্ধি পেতেই থাকল। ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে কিছু সংখ্যক ভ্রান্ত ধর্মমতবাদী – সম্ভবতঃ তারা ছিল মানিকীপন্থী জনতার চাপে রাজা কর্তৃক অসংযম ও ভোগ-লালসার দায়ে অভিযুক্ত হয় ও শাস্তিস্বরূপ খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তাদের পুড়িয়ে মারার আদেশ দেয়া হয়। তবে অনুরূপ ক্ষেত্রে – ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লিয়েজের ধর্মপাল ওয়াসনের বেলায় যেমনটি ঘটেছে – ধর্মপালগণ মৃত্যুদণ্ড প্রদান [১২২] বর্জন করতেন। ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কোলনের ভ্রান্ত ধর্মমতবাদীদের সম্মুখীন হলে ক্লেয়ারভোর বার্ণাড সর্বপ্রথম তাদের মন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর বেশী জোর দেন। কিন্তু কাউকে মণ্ডলীচ্যুত করাও যদি যথেষ্ট না হত, তাহলে তখন হিংস্র আচরণ করা আবশ্যক হয়ে উঠত যাতে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত রক্ষা পায় সেই সমস্ত শিয়ালের কবল থেকে যারা উহাকে বিধ্বস্ত করত।

দমননীতি তীব্রতর হওয়া

[১২২] কোন ধর্মপাল ভ্রান্ত মতবাদীদের মৃত্যু দাবি করতে পারবেন না

"আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও ত্রাণকর্তা যাদেরকে চান তারা বেঁচে থাকুক যাতে তারা শয়তানের ফাঁদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে, তাদেরকে জাগতিক তরবারি দ্বারা এ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা আমরা লাভ করিনি ... প্রভুর পথে যারা আজ আমাদের বিপক্ষ, তারাই ঈশ্বরের অনুগ্রহে ঐশরাজ্যে হতে পারে আমাদের চেয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ... যাদেরকে বলা হয় ধর্মপাল, সেই আমরা প্রভুর কাছ থেকে কাউকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের পবিত্র অভিষেক লাভ করিনি, বরং জীবন দানের অভিষেক লাভ করেছি।"

ওয়াসন, লিয়েজের ধর্মপাল, চালন্স-এর ধর্মপালের নিকট পত্র, আনুমানিক ১০৪৫ খ্রীঃঅঃ

[১২৩] ভ্রান্ত মতবাদীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আইন

"যে কেউ সুস্পষ্টভাবে তার ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল কর্তৃক ভ্রান্ত শিক্ষার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবে, তাকে ধর্মপালের অনুরোধে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেফতার করা হবে ও খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হবে। বিচারকগণ যদি মনে করেন তার জীবন রক্ষা করা দরকার বিশেষভাবে অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদীদের সতর্ক করার জন্য, তাহলে কাথলিক বিশ্বাস ও ঈশ্বরের নামে যে অশালীন জিহ্বা আক্রমণ করতে দ্বিধা করেনি, সে জিহ্বা কেটে ফেলা হবে।" (কাটানোর নিয়মাবলী ১২২৪)

[১২৪] ধর্মপালের ধর্মীয় তদন্তের জন্য ঃ তুলুস মহাসভার সিদ্ধান্তমালা

"শহরের মধ্যে ও শহরের বাইরের প্রতিটি ধর্মপল্লীতে ধর্মপালগণ কলঙ্কশূন্য খ্যাতির অধিকারী একজন যাজক ও দু'তিনজন কিংবা প্রয়োজন হলে আরও বেশী সংখ্যক ভক্তসাধারণকে নিযুক্ত করবেন যারা সেই ধর্মপল্লীতে বসবাসরত ভ্রান্ত মতবাদীদের অধ্যবসায়ের ও নিষ্ঠার সাথে খুঁজে বের করার শপথ গ্রহণ করবেন। তারা সন্দেহভাজন সমস্ত বাড়ী, শোবার ঘর ও প্রকোষ্ঠ এবং বিধ্বস্ত হয়ে পড়ার উপক্রম যত স্থানের অত্যন্ত গোপন গলিঘুঁচিতে যেতে সচেষ্ট হবেন। এতে যদি তারা ভ্রান্তমতবাদীদের বা তাদের আস্থাবান বা অনুগ্রহকারী কিংবা আশ্রয় বা নিরাপত্তাদানকারীদের খুঁজে পান, তাহলে তারা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তার ব্যবস্থা নেবেন ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানীয় ধর্মপাল ও সামন্তরাজ বা তার গোমস্তার কাছে তাদেরকে অভিযুক্ত করবেন।

অত্যাচারের মধ্য দিয়ে জেরা (পঞ্চদশ শতাব্দী)

পার্থিব প্রভুরা ভ্রান্তমতবাদীদেরকে ভিলা, বাড়ী বা বনজঙ্গলে যেখানে তারা একত্রিত হয় সেখানেই তাদের খুঁজে বেড়াবেন ও তাদের আশ্রয়স্থল ধ্বংস ক'রে দেবেন।"

[১২৫] ফ্রান্সের ধর্মপালের নিকট পোপ নবম গ্রেগরীর পত্র ১৩ই এপ্রিল ১২৩৩

"আপনি শত ব্যস্ততার মধ্যে আটকে আছেন এবং মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে দম ফেলারও সময় পাচ্ছেন না বুঝতে পেরে এবং অন্যদের সঙ্গে আপনার কাজের বোঝা সহভাগিতা করা যুক্তিসঙ্গত ভেবে আমরা আপনার নিকট পূর্বোক্ত বাণীপ্রচারক ভ্রাতৃদেরকে ফ্রান্স রাজ্যে ও আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে প্রেরণ করছি। তাঁদের প্রধান কাজ হবে ভ্রান্ত মতবাদীদের ঠেকানো। আপনার নিকট আমার বিনীত অনুরোধ আপনি তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবেন, তাঁদের ন্যায্য পাওনা তাঁদের দেবেন, তাঁদের ও অন্যদের ব্যাপারে তাঁদেরকে সু-পরামর্শ ও সহায়তা দেবেন এবং বন্ধুত্বের মনোভাব প্রদর্শন করবেন যাতে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তাঁরা যথাযথভাবে পালন করতে পারেন।"

২। ভ্রান্ত মতবাদীদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন

গ্রাসিয়ানের নির্দেশনামায় (১১৪০ খ্রীঃঅঃ) প্রচলিত যত আইনের মূল পাঠগুলোকে (রোমীয় আইন নির্দেশনামা ইত্যাদি) সন্নিবেশিত করা হয়। উক্ত নির্দেশনামায় ভ্রান্ত মতবাদীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের তিনটি সম্ভাব্য পর্যায় বা ধাপ নির্ধারণ করা হয়েছে, যথা – বুঝিয়ে মন পরিবর্তনের প্রচেষ্টা, আইনগত নিষেধাজ্ঞা (মণ্ডলী কর্তৃক ঘোষিত) এবং সবশেষে সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা অর্থাৎ রাজন্যবর্গ কর্তৃক বিচারের ব্যবস্থা করা। এই সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকরী হত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও দৈহিক শাস্তির মাধ্যমে। তবে এতে সুস্পষ্টভাবে কোন মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল না। ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ল্যাটেরান মহাসভা আধ্যাত্মিক সমস্যাগ্রস্ত ভ্রান্ত মতবাদী ও আলাদা দল/গোষ্ঠী গঠন করার কারণে যাদের বিরোধিতা না ক'রে উপায় ছিল না এমন ভ্রান্ত মতবাদীর মধ্যে একটা পার্থক্য করা হয়। ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় লিসিয়াস ও সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা এক সম্মিলিত দমন অভিযান শুরু করেন। কিন্তু এতে দোষী ব্যক্তিদের জন্য 'উপযুক্ত শাস্তির বিধান' সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আরাগনের রাজা পিটার ভ্রান্ত মতবাদীকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারার শাস্তিযোগ্য মারাত্মক রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বলে গণ্য করেন। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্টও মারাত্মক রাষ্ট্রদ্রোহিতারূপে ভ্রান্ত মতবাদের কথা বলেছিলেন।

আলবিজেনসীয় ধর্মযুদ্ধ

ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে তাঁর যে প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি ল্যাঙ্গুয়েডোক অঞ্চলে নিহত হলে পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট আলবিজেনসীয়দের বিরুদ্ধে এক ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন (১২০৮ খ্রীঃঅঃ)। আলবি এমন এক এলাকার কেন্দ্রস্থলে ছিল যেখানে অসংখ্য ভ্রান্ত মতবাদী অবস্থান করত। আলবিজেনসীয় নামটি প্রধানতঃ ক্যাথারপন্থীদের নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সময় সময় তা আবার ওয়ালডেনসীয়দের বেলায়ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধর্মযুদ্ধটি উত্তর ও দক্ষিণের সামন্তরাজদের মধ্যে একটি যুদ্ধে পরিণত হয়। উত্তরের সামন্তরাজরা এটাকে তাদের কয়েকটি জায়গীর পুনরুদ্ধারের একটি অছিলারূপে কাজে লাগায়। এই ধর্মযুদ্ধের সবচেয়ে জঘন্য ঘটনা হচ্ছে

[১২৬] ভ্রান্তমতবাদীদের দমনের সপক্ষে ঐশতাত্ত্বিক যুক্তি

"ভ্রান্ত মতবাদীদের ব্যাপারে দু'টি বিবেচ্য বিষয়ের কথা মনে রাখতে হবে, যথা – (১) তাদের পক্ষে (২) খ্রীষ্টমণ্ডলীর পক্ষে।

(১) ভ্রান্ত মতবাদী এমন পাপে জড়িত যার দরুণ শুধু মণ্ডলীচ্যুতির মাধ্যমে মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারই যোগ্য হয় না, সেইসঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে জগৎ থেকেও বিচ্ছিন্ন হওয়ার যোগ্য হয়। কেননা বিশ্বাসের মাধ্যমে যেমন আত্মার জীবন আসে, ঠিক তেমনি টাকার মাধ্যমেও দৈহিক জীবন প্রতিপালিত হয়। সেই কারণে টাকা-কড়ি জাল করার চেয়ে বিশ্বাস জাল বা বিকৃত করা অনেক বেশী মারাত্মক ব্যাপার। তাই যদি টাকা জালকারীরা বা অন্যান্য অপরাধীরা রাজন্যবর্গের দ্বারা তাদের অপরাধের জন্য ন্যায়তঃ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহলে আরও বেশী ভ্রান্ত মতবাদীরাও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে মণ্ডলীচ্যুত হতে পারে তা নয়, মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে।

(২) কিন্তু খ্রীষ্টমণ্ডলীর পক্ষে ভ্রান্ত মতবাদীদের মন পরিবর্তনের লক্ষ্যে করুণা প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে; আর তাই খ্রীষ্টমণ্ডলী কাউকে সঙ্গে সঙ্গে দোষী সাব্যস্ত করে না, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয়বার সতর্ক ক'রে দেওয়ার পরই মাত্র তা ক'রে থাকে, যেমনটি প্রেরিতশিষ্য আমাদের বলেছেন। এরপরও যদি তার কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে মণ্ডলী তার মন পরিবর্তনের আশা ছেড়ে দিয়ে অন্যদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাকে মণ্ডলীচ্যুতির শাস্তি প্রদান করে মণ্ডলী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করবে। এরপর তাকে সরকারী আদালতের হাতে ছেড়ে দেয় যাতে তাকে উপযুক্ত বিচারের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া যায়।"

টমাস আকুইনাস, Summa Theologica, IIa , IIae, 11 art.3

১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে বেজিয়েরস্-এর জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করা। এরা তাদের মহাগির্জায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েও এই অপমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়নি।

৩। ধর্মীয় তদন্ত

সঠিক অর্থে ধর্মীয় তদন্ত কথাটির উৎপত্তি হয়েছিল ১২২০-১২৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যখন নাকি ভ্রান্ত মতবাদীদের খুঁজে বের ক'রে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে শক্তি বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষমতাসীনগণ সহযোগিতা করেছিলেন এবং যখন পোপের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীতে এরূপ কার্যব্যবস্থাকে সার্বজনীন ক'রে তুলেছিল। উপযুক্ত শাস্তির বিষয়টি যখন স্থির করা হয়, তখনই মাত্র খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারাটা একটা নিয়ম হয়ে উঠে। প্রতিকারের চেষ্টার উপর প্রতিশোধের মনোভাব জয়লাভ করে। তবে মৃত্যু যে তখন সবচেয়ে প্রচলিত শাস্তি ছিল না, এতে কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যুদণ্ড ছাড়াও কারাদণ্ড, জরিমানা, তীর্থযাত্রায় প্রেরণ ইত্যাদি অন্যান্য অনেক শাস্তিও বর্তমান ছিল।

ধর্মীয় তদন্ত ও ধর্মীয় তদন্তকারীগণ

[১২৩] উৎপত্তি অনুসারে তিন ধরনের ধর্মীয় দণ্ড-ব্যবস্থাকে সচরাচর পার্থক্য করা হয়ে থাকে। তখন ছিল দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের
[১২৪] (১২২৪ খ্রীঃঅঃ) ও নবম লুইসের (১২২৯ খ্রীঃঅঃ) রাষ্ট্রীয় দণ্ড-ব্যবস্থা ; ধর্মপালের ধর্মীয় তদন্ত-ব্যবস্থা (তুলুস,
[১২৫] ১২২৯ খ্রীঃঅঃ) এবং পোপীয় তদন্ত-ব্যবস্থা । ১২৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগরী পূর্বতন আইন পুনরুজ্জীবিত ক'রে ধর্মীয় তদন্ত ব্যবস্থাকে সরাসরি পোপের অধীন একটি বিশেষ বিচারালয়ে পরিণত করেন। তিনি এই বিচারালয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করেন ডমিনিকান বাণীপ্রচারক ভ্রাতৃগণের উপর বটে, কিন্তু গৌণ ভ্রাতৃগণের উপরও দায়িত্ব প্রদান করেন। এমন এক জটিল প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে যা ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দে দৈহিক নির্যাতনের প্রয়োগ অনুমোদন করে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর দণ্ডাদেশ প্রদানের সরাসরি দায়িত্ব ছিল খ্রীষ্টমণ্ডলীর এবং তা কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব থাকত রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উপর। এর জন্য যা ছিল সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়, তা হল দণ্ড প্রদানের সপক্ষে সত্যতা
[১২৬] প্রতিপাদক একটি ঐশতাত্ত্বিক যুক্তি। টমাস আকুইনাস এই যুক্তি প্রদান করেন।

খ্রীষ্টমণ্ডলী সুসমাচারের দোহাই দিয়ে যারা এর শিক্ষা মানত না, তাদেরকে কি করে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়াত, তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। কোন কোন ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান সমাজ ব্যবস্থা ছিল এমন এক শাসনব্যবস্থা যা একদল, একমতের পক্ষপাতী না হলেও অন্ততঃ কর্তৃত্ববাদী ছিল, এবং বলপ্রয়োগের উর্ধ্বে ছিল না। নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মণ্ডলী সমকালীন দণ্ড-ব্যবস্থার – নির্যাতন ও মৃত্যুদণ্ডের – ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেনি।

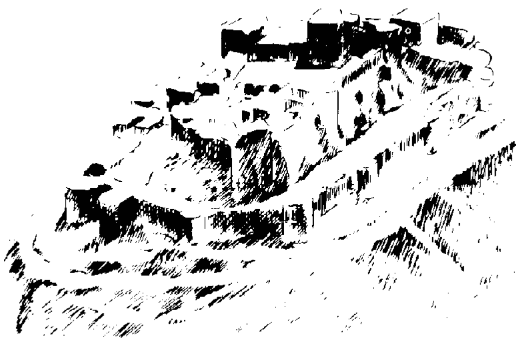

সিরিয়ায় বীরযোদ্ধাদের ক্রাক

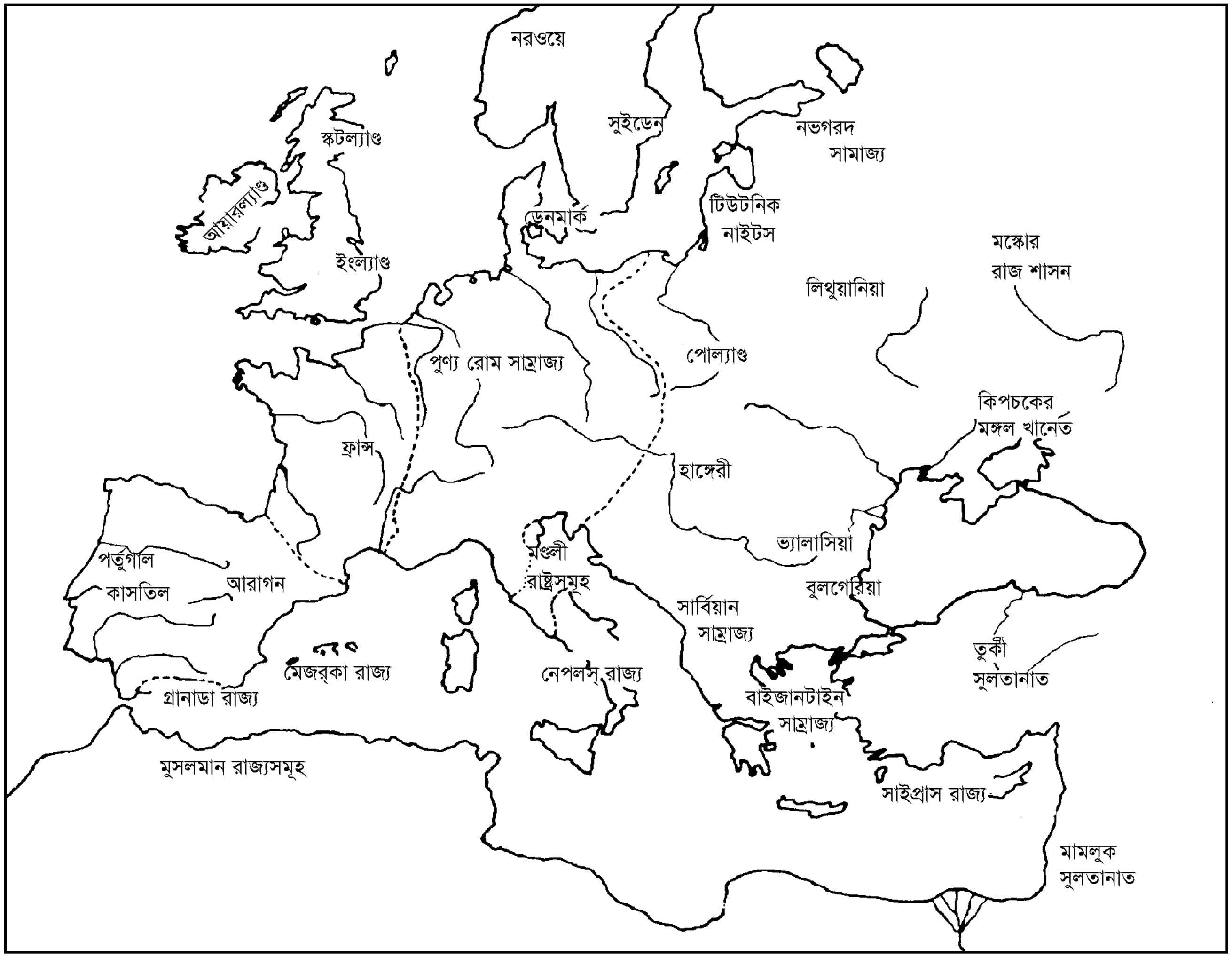

চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র